কবি

লিটল কবিতাপত্র

ঈদ আনন্দ সংখ্যা'২০২২

সম্পাদক
র. আমিন

প্রচ্ছদ
তাইয়্যেব সৃজন

প্রকাশক
Amazon.com Inc., USA

সম্পাদকীয়

সবাইকে পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা।

প্রতিবছর যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ঈদ পালিত হয়ে থাকে। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর যখন আকাশে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায় তখন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর পালিত হয়। ঈদ হলো ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও একতার প্রতীক। এই ঈদে ধনী গরীব বিবেধ ভূলে সকলে একসাথে আনন্দ উপভোগ করবো, এমনটিই হোক আমাদের সকলের প্রত্যাশা। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস-
ঈদ আনন্দ সংখ্যা'২০২২।

আজমাইন মাহতাব - ৪
শৈশবের রোজার ঈদ

আহমেদ মাসুদ ইকবাল - ৫
আমার ছেলেবেলার ঈদ

কাজী মিরা - ৭
শৈশবের রোজা ও ঈদ এর স্মৃতি

পলাশ মোস্তাফিজুর - ১০
আমাদের ঈদ আমাদের রমজান

মোঃ নাসের আখতার করিম - ১২
ঈদ আনন্দ লেখা

র. আমিন - ১৪
ঈদ আনন্দের সেই দিনগুলি

শামসুন নাহের রুবী - ১৭
শৈশবে রোজার দিনগুলো

ঈদ-এর রান্নাবান্না ও অতিথি আপ্যায়ন - ১৯

ঈদের সাজ হোক পরিপাটি ও স্নিগ্ধ - ২১

ঈদে বেড়ানো - ২৩

ঈদের কবিতা - ২৬

ঈদের গান - ২৭

আজমাইন মাহতাব

শৈশবের রোজার ঈদ-এর স্মৃতি চলে এলো আমাদের মাঝে। আমাদের প্রাণপ্রিয় উৎসব পবিত্র ‘ঈদুল ফিতর’ অর্থাৎ রোজার ঈদ। রোজার ঈদ নিয়ে সবারই শৈশবে কিছু না কিছু স্মৃতি অবশ্যই রয়েছে, ঠিক তেমনি আমারও রয়েছে।

প্রথমেই শৈশবে রোজাগুলো কেমন কাটলো সেটা নিয়ে বলি- আপনারা জেনে খুশি হবেন আমি ছোটবেলা থেকেই সবগুলো রোজা রেখেছি। প্রথমে আমার বয়স যখন আট বছর কিংবা তারও আগে ৭ বছর, তখন থেকে রোজা বুঝতাম। না খেয়ে থাকা সারাদিন তারপরে ইফতারি করা এবং ভোররাত্রে সেহরি করা- এতোটুকুই তখন চাইতাম রোজা রাখতে, কিন্তু আব্বা-আম্মা সহ বড় ভাই-বোনেরা এবং আশেপাশের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীরা বুঝাতো- এভাবে সকালে খেলে একটা রোজা, দুপুরে খেলে দুইটা রোজা এবং রাতে খেলে তিনটা রোজা। এভাবে যখন আমার বয়স ৯ বছর, তখন আমি রোজা রাখা শুরু করি।

পরিপূর্ণভাবে একটা, দুইটা, তিনটা- একদিন, দুইদিন, তিনদিন কিন্তু চতুর্থ দিনে দেখা যায় আমার শরীর একদম দুর্বল হয়ে যায়। তখন সবার পরামর্শে ওই রোজাটা আর রাখতে পারেনি ওই বছর। আল্লাহর রহমতে প্রায় ১৬টি রোজা পরিপূর্ণভাবে রাখতে পেরে ছিলাম। যখন আমার বয়স ১০ বছর, তখন থেকে এখন পর্যন্ত সবগুলো রোজা পরিপূর্ণ ভাবে রাখতে পেরেছি ইনশাআল্লাহ। তারপর আসলো ঈদ- ঈদের আনন্দ শুরু হতো চাঁদ রাত থেকে। তারপর ঈদের দিন সকালে নতুন পোশাক অর্থাৎ নতুন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে আব্বার সাথে নামাজে যেতাম কিছু মিষ্টান্ন খেয়ে। তখন নামাজ শেষে অনেকের সাথে দেখা হত, তারপর বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনদের বাসায় যাওয়া হত। আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় ছিল- সালামি, তখন সালামির জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম, সত্যি সেই দিনগুলো আর পাওয়া যাবেনা। কিন্তু আমার কাছে এবারের ঈদ ভিন্ন কারণ- গত বছর জুলাই মাসে আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি। এবার বাবাকে ছাড়া আমার প্রথম ঈদ, সবাই আমার বাবার জন্য দোয়া করবেন।

আহমেদ মাসুদ ইকবাল
আমার ছেলেবেলার ঈদ

আমার শৈশব স্মৃতি থেকে ঈদের দিনের অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের কিছু আনন্দঘন স্মৃতি লিখবার চেষ্টা আমার এই লেখাতে। হাবাগোবা টাইপের বলতে যা বোঝায় ছোটবেলায় আমি ঠিক তাই ছিলাম। অন্তত গাধা, গর্ধভ, উল্লুক, বলদ এই শব্দগুলো আমার উপর প্রয়োগ করা হতো অনিবার্যভাবে। স্বভাবে বেশ লাজুক ছিলাম বলেই মায়ের শাড়ির আঁচল ধরে মায়ের সাথে সারা বাড়ি ঘুরঘুর করতাম। এমন ভাবে মায়ের সাথে আঠার মত লেগে থাকতাম যে আমাকে মায়ের কাছ থেকে সরায় এমন সাধ্যি কার আছে ?

ভীতু ছিলাম-অসম্ভব ভীতু। রাতের বেলায় শিয়ালের ডাক শুনলে ভয়ে কান্না জুড়ে দিতাম। চোরের ভয়ে একা একা এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাবো, এই কথাটি ভাবতে গেলেই সর্বাঙ্গে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসতো। লোডশেডিং হলে কেঁদে কেটে গোটা বাড়ি মাথায় তুলে ফেলতাম। আমি প্রদীপের আলোয় নিজের বিশাল ছায়া দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেছি, এবার বুঝুন আমার বাহাদুরির দৌড়। বয়স কত হবে তখন, বড় জোর সাত কিংবা আট। রোজার কি বা বুঝি ? এক আধটা রোজা থেকেছি কদাচিৎ। সেই ছোট্ট মনের আনন্দ হয়তো সেদিন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতো পরম আনন্দের আতিশয্যে। সাইরেন আর মসজিদের মুয়াজ্জিনের আযানের অপেক্ষায় সন্ধ্যা যেন নামতেই চাইতো না, এদিকে পিপাসায় গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ, মা সতর্ক নজর রাখছেন যাতে একেবারে শেষ মুহূর্তে আবার পানি পান না করে বসি।

আমার হাঁসফাঁস দেখে মা আদর করে জড়িয়ে ধরে আমাকে বলতেন,
- মানিক সোনা আজ তোমার জন্য জানো, অনেক রকমের শরবত বানিয়েছি। জানি অনেক পিপাসা পেয়েছে তোমার। তাই বিশেষ করে তোমার পছন্দের রুহ-আফজা শরবত, লেবুর রসের ইসবগুলের ভুসি আর তোকমার শরবত আর বরফ কুচি দিয়ে অরেঞ্জ স্কোয়াশ।
মায়ের কথা শুনে জল তেষ্টার কথা ভুলে গিয়ে আদুরে গলায় মায়ের কাছে জানতে চাইতাম,
- বাখরখানির কথা।
মা আশ্বস্ত করে বলতেন,
- সেটাতো সকলের আগেই বানিয়ে রেখেছি তোমার জন্য।
এই বয়সে রোজা রাখা বড় কথা নয় সবচাইতে আনন্দের ব্যাপারটি হলো ইফতারির টেবিলে। ওখানে আছে সব মুখরোচক খাবার। পিয়াজু, বেগুনি থেকে ধরে লাচ্ছা সেমাই কিংবা সুজির হালুয়া আর সেই সাথে ভুনা খিচুড়ি। তখন মনে হতো রমজান মাস বিদায় না নিলেই সবচাইতে ভালো হতো। রমজানের শেষের দিনগুলি ছিল আমার কাছে মহা আনন্দের। বাবা-চাচারা মিলে ঈদের কেনাকাটা শুরু করে দিতেন।
মার্কেট থেকে নিয়ে আসা হতো মা-চাচি খালা দের জন্য রং বেরঙ্গের শাড়ি। মার্কেটে এই সময়টাতে প্রচুর ভিড় থাকে বলে বাড়ির মহিলাদেরকে মার্কেটে না নিয়ে একটা গোটা মার্কেট বাড়িতে এনে হাজির করে দিতেন আমাদের বাবা-চাচারা। মা চাচী-খালা তাদের পছন্দের শাড়ি নিজেরাই পছন্দ করে নিতেন। শাড়ি পছন্দের ব্যাপার চুকে গেলে বাকি শাড়িগুলো নিয়ে ফেরত দিয়ে কেনা শাড়িগুলোর মূল্য পরিশোধ করে দিয়ে আসতেন বাবা-চাচারা নিজেদের দায়িত্বে। আমাদের ছোটদের কোন পছন্দ ছিলনা। বাবা-চাচারাই নিজেরা পছন্দ করে আমাদের জন্য পাঞ্জাবি-পাজামা, শার্ট-প্যান্ট এমনকি পায়ের জুতো পর্যন্ত নিয়ে আসতেন। নতুন জামা-জুতার আনন্দে আমরা অধীর হয়ে ঈদের দিনটির অপেক্ষায় থাকতাম। আর অপরদিকে মা-চাচী আর খালারা চুড়িওয়ালীদের অপেক্ষায় দিন গুনছেন। বেতের ঝাকি মাথায় নিয়ে চুড়িওয়ালীরা ঠিক এসে হাজির হতো। আমাদের মা-চাচী আর খালারা পছন্দমত চুড়ি, প্রসাধনী, চুলের ফিতা, চুলের ক্লিপ কিনে মনের আনন্দে বিভোর থাকতেন।

রমজানের শেষ দিনটিতে ইফতারের শেষে ঈদের চাঁদ দেখা হয়ে গেলেই শুরু হতো উৎসবমুখর পরিবেশ আমাদের বাড়িতে, বসতো মেহেদী সন্ধ্যা। পাশের বাড়ির ছোট-বড় মেয়েরা তাদের নানী-দাদী, মা-খালা-

চাচীদেরকে নিয়ে চলে আসতো আমাদের বাড়ির মেহেদী উৎসবে। ঘরের বারান্দা আর উঠোন জুড়ে রাতভর চলতো হাতে-হাতে মেহেদির নকশা আঁকা আর কথায় কথায় হাসি-আনন্দ। আমরা ছোটরাও বাদ যেতাম না, আমাদের হাতও হয়ে উঠতো মেহেদীর রঙে রাঙা। সেই মেহেদী রাঙা সুখের হাত দেখিয়ে দেখিয়ে ছুটে বেড়ানোর আনন্দ ঘন ছেলেবেলার নাচনের সুখ এখন কি আর আছে ? এখন শুধু স্মৃতিময় দিনগুলি চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়।

ঈদের দিন ফজরের নামাজ আদায় করে এসেই, বাবা-চাচাদের হাঁকডাকে ছোট বড় সকলের ঘুম ভেঙ্গে যেত। তারপর শুরু হতো পালা করে স্নান করা। আমাদের মা-চাচীরা আমাদেরকে গোলাপজলে স্নান করিয়ে তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে মুখে সেমাই তুলে দিতেন। তারপর অজু করিয়ে নতুন পাঞ্জাবি-পায়জামা পরিয়ে, মাথায় চড়িয়ে দিতেন রংবেরঙের টুপি। তারপর আমাদেরকে সুবাসিত আতর মাখিয়ে বাবা-চাচাদের হাতে তুলে দিতেন ঈদের জামাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। হযরত শাহজালালের মসজিদ প্রাঙ্গণে বিশাল জামাতে মুসল্লিরা আসতেন দূরদূরান্ত হতে। আমি এত মানুষের সমাগম দেখে অবাক হতাম আর ঘুরে ঘুরে চেয়ে দেখতাম রঙ্গিন জামা পরা মানুষের অরণ্য। আশেপাশের আমার সমবয়সী ছেলেরা দুষ্টুমিতে মেতে উঠতো কিন্তু আমার সে সুযোগ ছিল না কারণ পাশেই বাবা-চাচা সবাই আছেন বলে সে আশায় গুড়ে বালি।

আমার নামাজ পড়াটাও অনুকরণ করে-নামাজের দাঁড়ানো, হাত বাধা, রুকু-সেজদা সবই অনুকরণ করে করতাম। এতটুকুন বয়সে নামাজের নিয়ম-কানুন বা নিয়ত কোন কিছুই যে বুঝে আসেনি তখনও। নামাজ শেষে বাবা-চাচাদের সাথে অনেক মানুষ কোলাকুলি করত। আমিও মনের আনন্দে আমার সমবয়সীদের সাথে কোলাকুলি করে বাড়ি ফিরে আসতাম। বাড়ি ফিরে বড়দেরকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে হতো এবং এটাই ছিল ঈদের দিনের রেওয়াজ। অবশ্য প্রচুর সেলামী পেতাম সবার কাছ থেকে। আমার ঈদ সেলামীর টাকা সবটাই তুলে দিতাম মায়ের হাতে।

আমাদের বাড়িতে ঈদের রান্না হতো হরেক রকম। মাংস, পরোটা, বিরিয়ানি, ফিরনি, হালুয়া, চটপটি, হালিম ,নারকেল দিয়ে বানানো পিঠা পুলি, কোন কিছুই বাদ পড়তো না। মেহমানরা আসতেন তাদেরকে সমাদরে আপ্যায়ন করতে মা-চাচীরা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। বাবা-চাচাদের বন্ধুরা এসে আড্ডা জমিয়ে তুলতেন। আমার বেশ কয়েকজন আমোদ প্রিয় নানী আমাকে ঠাট্টা করে জ্বালিয়ে মারতেন। ঈদের দিনে এই নানীরা আমাদের বাড়িতে আসলে তাদের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি খাট-পালংকের নিচে নিজেকে লুকিয়ে রাখতাম। তবে এই নানীদের কাছ থেকে আমি সেলামী পেতাম সবচাইতে বেশি। আমার এসব নানীদের কেউই আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাদের স্মৃতি আজও বেঁচে আছে আমার মাঝে।

ঈদের দিন বিকেলে নতুন জামা কাপড় পড়ে মায়ের সাথে যেতাম নানার বাড়ি। নানার বাড়িতে মামা খালাদের মুখে আমার নতুন জামার প্রশংসা শুনে বুকটা ফুলে উঠতো গর্বে আনন্দে। নানার বাড়ি থেকেও পেতাম ঈদের সেলামী। সমবয়সী মামাতো ভাই-বোনদের সাথে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতাম এখানে সেখানে। রাতের বেলা বসতো ছোটদের গল্পের আসর। গল্পের মধ্যমণি আমাদের নানা ভাই। দাওয়ায় বসে নানা ভাইয়ের মুখে শুনতাম মন মাতানো সব রূপকথার গল্প। রাত গভীর হয়ে আসলে এক সময় ডাক পড়তো খাবার টেবিলে। গল্পের আসর ছেড়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়তাম। নানা বাড়িতে দিন দুয়েক কাটিয়ে আবার ফিরে আসতাম মায়ের সাথে আমাদের নিজেদের বাড়িতে। মেহমানদের আসা-যাওয়ার মাঝে আমাদের বাড়িতে ঈদের আমেজ থাকতো বেশ কয়েকদিন ধরে। ছেলেবেলার সেই ঈদের আনন্দের দিন গুলি ভুলে থাকা যায়না। তবে এখন বুঝি বড়রা ঈদের আনন্দ উপভোগ করেন, ছোটদের ঈদের আনন্দের মাঝে। আমাদের বড়দের মাঝে ঈদ আসে প্রতি বৎসর রমজানের শেষে ছোটবেলার স্মৃতিগুলো ফিরিয়ে দিতে।

সবাইকে আমার ঈদ মোবারক এবং ঈদুল ফিতরের আনন্দঘন শুভেচ্ছা।

কাজী মিরা
শৈশবের রোজা ও ঈদ এর স্মৃতি

এখন রোজার মাস সামনে ঈদ।

মনে পড়ে যায় বাবা মায়ের ও ভাই বোনের সঙ্গে এক সঙ্গে রোজা আর ঈদের সেই চমৎকার দিনগুলোর কথা। আমার বাবা একজন সরকারি অফিসার ছিলেন তাই আমাদের বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হয়েছিল।
ছোট বেলায় রোজা মানে হলো আমাদের তিনবেলা খেলেই একটা রোজা হয়ে যাবে। তাও রাখার অনেক চেষ্টা করতাম। রোজা রাখি আর না রাখি সেহরি তো খেতেই হবে। আমাদের বাসায় সেহরির খাবার ছিলো ঘর পাতা দই আর চিড়া। যা আমরা অন্যসময় সকালে নাস্তা করতাম। আমি জানতাম সেহরির খাবার মানেই দই আর চিড়া।
একদিন স্কুলের সহপাঠীদের গল্প হচ্ছিলো ওরা কে কি খেয়েছে কেউ বললো-গরুর মাংস দিয়ে ভাত, একেক জন একেক কথা বলছিলো, আমি বললাম সেহরিতে কেউ এসব খায় ? আমি খুব অবাক হলাম বাসায় এসে আম্মাকে বললাম,
- সেহরিতে ওরা এসব খায়।
আম্মা বললেন,
- অনেকেই ভাত খায়।

আমাদের বাসায় ইফতারেও অন্যরকম আয়োজন ছিলো। রাতে কাঁচা ছোলা ভিজিয়ে রাখতো সেটাই আমার আব্বাকে দেখতাম সেই কাঁচা ছোলা- আদা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, পুদিনা পাতা, লেবুর রস, সরষের তেল দিয়ে কতো যত্ন করে মাখাতেন, খেতেও আহ্ সুস্বাদু ! এটাই ছিলো আমাদের ইফতারের মেইন আইটেম। আরো অন্যসব কিছুতো থাকতোই- পিঁয়াজু, শরবত, জিলাপি ইত্যাদি। আমরা কাঁচা ছোলা খাই, মানে আমি ভাবতাম এটাই সবাই খায় একটু বড় হওয়ার পর তা বুঝতে পারলাম। সেই থেকে বাবার শেখানো সেহরির খাবার আর কাচা ছোলা ছাড়া ইফতার ভাবতেই পারিনা।

এবার সেই ছোট্ট বেলার ঈদের স্মৃতি। রোজার মাঝেই শুরু হয়ে যেতো। আমার খুব মনে পড়ে আমি তখন মাত্র স্কুলে যাওয়া শুরু করি, আমার জন্য আমার সেজো বোন ঘাগড়া বানাতে দিলেন। আমার বড় ভাই সেই ড্রেস এনে আমাকে চেয়ারের উপর দাড় করিয়ে পড়ালেন, উপরের অংশটা ব্লাউজ আর নিচের ঘের দেওয়া ঘাগড়া। ভাই-বোনের সে কি আনন্দ ? আমি তো কিছুই বুঝিনা শুধু ঘুরতাম- ঘুরলে ফুলে উঠতো এটাই ছিলো আমার আনন্দ। একটু বড় হওয়ার পর আম্মা কাপড় কিনে স্কাট-টপস্ বানাতে দিতেন। আর আব্বা টেইলার্স-এ নিয়ে গিয়ে ছোট হাতাকাটা খুব সুন্দর করে ডিজাইন বলে দিতেন কিভাবে বানাবে, এটুকু মনে আছে- বলতেন ইন্ডিয়ান ডিজাইন। নতুন নতুন জামা কাপড় কবে টেইলার্স দেবে, প্রতিদিন গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম হয়েছে ? কবে হবে ? প্রতিদিনই যেতাম।

সেই নতুন জামা কাপড়গুলো হাতে পাওয়ার পর সকাল বিকালে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম। আর কেউ যাতে না দেখে লুকিয়ে রাখতাম কেউ দেখলেই ঈদ হবে না। এমনও সময় হয়েছে একদিন বালিশের নিচে রাখতে হয়েছিল, কারন বান্ধবীরা চলে এসেছিলো। আমার তখনও মন ভরেনি কারন আমার আসল ঈদের জামাতো আসেনি ঢাকা থেকে। বড় দুই বোন আসবে সুন্দর জামা আনবে সেই অপেক্ষায় থাকতাম। দুই বোন মিলে সুন্দর ডিজাইনের জামা, স্কাট আর শার্ট, অন্যদিকে মেজ আপা আপেলের বিচির মালা, নেইলপলিশ, ছোট সুন্দর লাল ঝোলানো ব্যাগ নিয়ে আসতেন। বড় ভাই বোনরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি তে পড়তেন, ঈদের ছুটিতে সবাই একসাথে বাসায় আসতেন, এটাই ছিলো আরেক ঈদের দিন আমাদের কাছে।

তারপর শুরু হতো ঈদ কার্ড কেনা- দুই টাকা, পাঁচ টাকা করে ছিলো। আমার সেজো আপা ঈদ কার্ড বানিয়ে দিতেন আর্ট পেপার কিনে, ছোট ছোট করে কেটে উপরে ছবি এঁকে দিতেন নিজেও করতাম। আমার সেজো ভাইয়ের বাগান ছিলো- আমার কাজ ছিলো গাছে পানি দেওয়া, মানে 'মালিনি'। সেই বাগানে ঝাউগাছের পাতা আর গোলাপের কলি দিয়ে সেজো আপা ঈদ কার্ড বানিয়ে দিতেন, খামও বানিয়ে দিতেন। কার্ডের ভেতরে সুন্দর ডিজাইন করে লিখে দিতেন, সেগুলো সবার বাসায় বাসায় দিয়ে আসতাম। কার্ডের লেখাটাও আনকমন হওয়া চাই- তাই ভাই বোন মিলে লিখে দিতেন। ঈদের আগের দিন চাঁদ দেখার সাথে সাথেই আমাদের আনন্দ শুরু হয়ে যেতো। আম্মা সন্ধার পর টেবিলে সেমাই আর আমাদের এলাকার পাতার পিঠা ভেজে দিতেন। আমি ও আমার ছোট ভাইয়ের অপেক্ষা-কখন সকাল হবে নতুন জামা পড়বো। ঈদের দিন সবার আগে আমি ও আমার ছোট্ট ভাই গোসল করে নতুন জামা পড়ে রেডি হয়ে যেতাম। আব্বা আর ভাইয়েরা নামাজে যেতেন। আমার মেজো বোন আমাকে সাজিয়ে দিতেন নেইলপলিশ আর ঠোঁটে লিপস্টিক, আহ্ ! সেই লিপষ্টিক এর অপেক্ষায় থাকতাম বছরের এই একটা দিনের। আব্বা আর ভাইয়েরা কখন নামাজ থেকে আসবে বারান্দায় আব্বার ইজিচেয়ারে বসে অপেক্ষায় করতাম। এরপর সালাম করে পাঁচ টাকা, দশ টাকা পেলেই কতো খুশি হতাম। ছোট্ট লালব্যাগে ভরে বান্ধবীদের সাথে ওদের বাসায় যেতাম। কিন্তু দুপুরের আগে বাসায় আসতে হতো।

ঈদের খাবারের মধ্যে Special একটা রান্না ছিলো কোরমা- বড় বড় মোরগ দিয়ে ঘরপাতা দই আর খাঁটি ঘি দিয়ে চমৎকার রান্না। পরিবারের সবাই একসাথে খাওয়ার পর বিকালে আমার সেজো ভাই বলতেন,
-তোদের একটা মজার খাবার খাওয়াবো, আর তা হলো বিকালের নাস্তার পর 7 Up খাওয়ানো। আমি সে কি আনন্দ করে খেতাম ! 7up- এর ঝাঁঝ-এ চোখে পানি আসতো তাও খেতে হতো। আর সেজো ভাই পাঁচ টাকা সালামি দিতো। আহা সেই দিনগুলোর মনে পড়লে চোখ ভিজে যায় ! সন্ধ্যায় শুরু হতো ঈদের অনুষ্ঠান দেখা, একমাত্র বিটিভি তাই কতো আনন্দ ছিলো সেই সব দিনগুলোর। আমরা চার বোন, চার ভাই আমাদের যেমন আনন্দ হতো আবার মজার মজার ঝগড়াও হতো। এখন আর ঈদের সেই আনন্দ পাই না কেমন কষ্ট লাগে। আব্বা আম্মা কেউ বেঁচে নেই। আম্মাকে স্কুলে থাকতেই হারিয়েছি, তাই বোনরাই আমার মায়ের আদর দিয়ে বড় করেছেন।

সবাই আমার আম্মা আব্বার জন্য দোয়া করবেন।
আল্লাহ ওনাদের বেহেস্ত নসিব করুন।

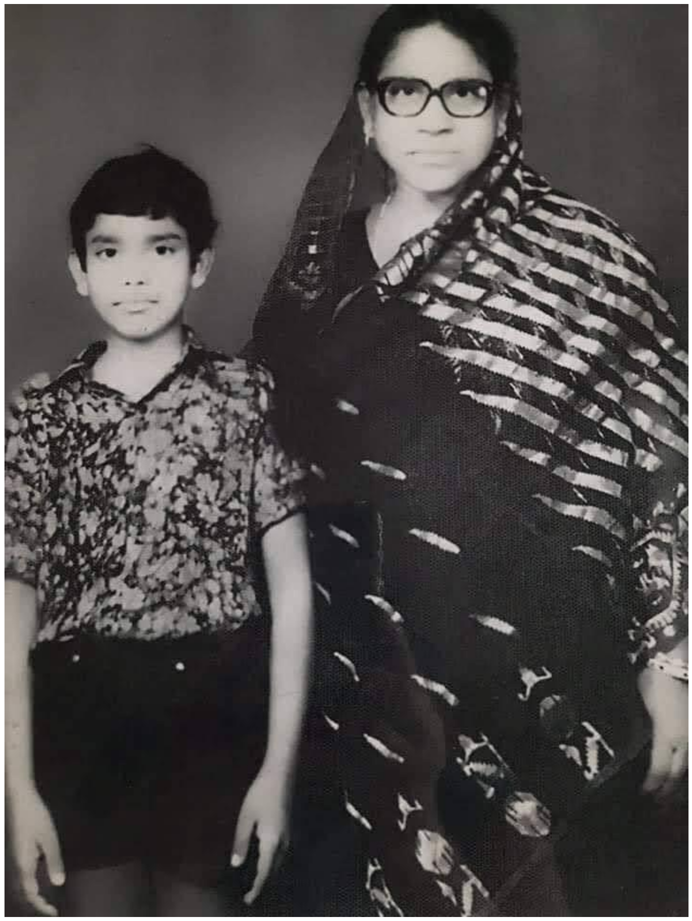

পলাশ মোস্তাফিজুর
আমাদের ঈদ আমাদের রমজান

১৯৭২- ৭৩ এর রমজান মাসের দিনগুলো এখনকার তুলনায় আরও আনন্দময় ছিলো। তখন মসজিদে মাইক ছিলো না। আমরা বাড়ির সামনে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে মসজিদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ঐখান থেকেই মসজিদের মিম্বরে কি হচ্ছে তা দেখা যেতো। মুয়াজ্জিন আজান দিতেন খালি গলায়। আমরা দৌড়ে বাসায় যেতাম। তখন সাইরেন বাজতো আর প্রচন্ড শব্দের বোমা ফাটতো। সবাই তখন যে যার ঘরে। আমরা পাটি বিছিয়ে ইফতার আর শরবত নিয়ে বসতাম। সামান্য বুট, মুড়ি বড়জোর একটা চপ বা বেগুনি এই ছিলো ইফতার। তবে তখন আম কাঁঠাল এর মৌসুম থাকায় ওগুলো থাকতো। আর প্রান জুড়ানো আখের গুড়ের শরবত। এই আখের গুড় আর পাইনা। এখন যা পাওয়া যায় তা হলো চিনির কলের গাদ কিনে ওতে চিনি মিশিয়ে গুড় নামে চিনির ডাবল দরে বেচা ভেজাল গুড়। এরপর বাড়ির পুরুষ সদস্যরা সবাই মিলে মসজিদে তারাবী নামাজ পড়তে যেতাম।

<u>ঈদুল ফিতর</u>
আমরা সারা বছর অপেক্ষা করতাম এই দিনটির জন্য। তখন রেডিমেড কাপড় চোপড় বিক্রি করতে দেখিনি। টান বাজারে থান কাপড়ের দোকান থেকে কাপড় কিনে ওখানেই দর্জির দোকানে বানাতে দেয়া হতো। ঈদের আগের দিন পাওয়া যেতো ওগুলো, ওগুলো লুকিয়ে রাখা হতো। কেউ দেখলে পুরোনো হয়ে যাবে। আমাদের সবাই তখন সারা মাস জুড়ে অপেক্ষা করতাম কখন চাঁদ উঠার খবর পাবো। চাঁদ উঠার খবর পেলে কথা নেই। শুরু হ'য়ে যেতো পটকার উ্তসব। ঐসময় প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে পুকুর ছিলো। পুকুরে বাঁধানো পাকা ঘাট, সবাই সেই ঘাটে গোসল করতে যেতো। ঈদের দিনের বড়ো আকর্ষণ ছিলো 'কসকো' গ্লিসারিন সাবান দিয়ে গোসল করা। ঐ সময় এটা ছিলো ঈদের সবচেয়ে বড়ো অনুসঙ্গ। শৈশবের সেই সুঘ্রাণ এখনো যেনো পাই।

<u>হাতে বানানো সেমাই</u>
তখন সব ঘরে সেমাই হাতে বানানো হতো। ময়দা গুলে একটা কাঠের তক্তায় হাত দিয়ে এই সেমাই বানানো হতো। পরে ওগুলো রোদে শুকিয়ে বেকারিতে টালা হতো। ঈদের আগের দিন গোয়ালপাড়া (নয়ামাটি) থেকে খাঁটি দূধ কিনে আনা হতো। ঐ দূধ ঘন করে তাতে রান্না করা হতো সেই সেমাই। সকালে গোসল করে নামাজ পড়তে যাওয়ার আগে সেমাই খেতাম সবাই।

<u>মোকরম</u>
ঈদের দিন বিক্রি হতো এই সুস্বাদু খাবারটি। নামাজ পড়ে বের হওয়ার পথে এই 'মোকরম' না খেলে ঈদই যেন মাটি হয়ে যেতো।

<u>আতর লাগানো</u>
ঈদের দিন সুরমা আর আতর লাগানো হতো। কতো রকমের আতর যে পাওয়া যেতো। তখনও দামী সুগন্ধি অতটা সহজলভ্য নয়। তবে যাদের সামর্থ্য ছিলো তারা সুগন্ধি ব্যবহার করতো।

<u>সালাম এবং সালামী</u>
টাকা তখন সহজলভ্য নয়। আমরা সালামী পেতাম খুচরা পয়সায়। সিকি আধুলি বড়জোর কাঁচা টাকা। আগেই ব'লেছি আমরা ছিলাম বিশাল এক পরিবারের, তাই দল বেধে সবাই বের হতাম সালাম করতে। মুল আকর্ষণ সালামী। আত্মীয় স্বজনের বাড়ি বাদ পড়তো না। সবাই যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী সালামী দিতেন।

সারোয়ার চাচার পরিবার এবং ঈদ
আমাদের পরিবারের ঈদের সাথে মোস্তফা সারওয়ার চাচার পরিবারের ঈদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। ঈদের পরদিন সারোয়ার চাচার পুরো পরিবার, তারা চাচা, হাসু চাচা, টুনটুন ফুপু, মহুয়া খালা, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ফুপা, লীলা ফুপু, নীপা আপা, প্যাভেল, রাসেল, খোকন মামা সবাই চলে আসতেন আমাদের সাথে ঈদ করতে। আমাদের ভাইবোন সবাই মিলে ঈদ করতাম। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ফুপাকে সালাম করলে উনি আমাকে ১০০ টাকার একটা নোট সালামী দিয়েছিলেন। আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো সালামী ছিলো সেটা। ঐ সময়ের যারা আছেন তারা এর মুল্য বুঝতে পারবেন। সারোয়ার চাচার পরিবারের সাথে আমাদের পরিবারের আরও অনেক কথা পরবর্তী পর্বে থাকবে।

ঈদের দিন খাওয়া-দাওয়া
ঈদের দিন প্রায় ঘরেই খিচুড়ি রান্না করা হতো। বাজার থেকে আগে কাঁচা মুগ ডাল কিনে বাসায় টেলে নেয়া হতো। ঈদের আগের দিন দিগু বাবুর বাজার থেকে গরুর মাংস আনা হতো। আর পোলাও এবং খাসির মাংস বা মুরগী। যে যে বাসায় যেতাম অল্প অল্প করে খাওয়া হতো।

আমার কাজিনরা
আমার শৈশবের স্মৃতি কাজিনদের ছাড়া অসম্পূর্ণ। সমবয়সীদের মধ্যে আমার জেঠাতো ভাই হাইয়ুম আর টুটু। আরও ছিলো মামুন, আলমগীর, দূলাল, হেলাল। বোনেরা ছিলো ভুবন আপা, বিপু আপা, রোজী, রুমা, আরজু, আসমা, শাহনাজ, লিপি, সালমা। ভাগ্নী চিনু আর মিনু। আলাউদ্দিন মিয়া চাচার পরিবারের কথা না বললে আমার স্মৃতিচারন অসম্পূর্ণ থাকবে। এই পর্বের পরে সারোয়ার চাচার পরিবার আর মিয়া চাচার পরিবারের কথা বিশেষ ভাবে থাকবে।

মোঃ নাসের আখতার করিম
ঈদ আনন্দ লেখা

ইদানিং কেন জানি শৈশবের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা বেশী বেশী মনে পড়ছে। মূল রমজান ও ঈদের গল্পে আসার আগে সামান্য কিছু ভূমিকা দেই। তিন ভাই বোনের মধ্যে আমি ছিলাম মেজো, আমার বোন সবার বড়। ছোট ভাই এর সাথে আমার চার বছরের ব্যাবধান ছিলো। বাবার মিলিটারী শাসন। সন্ধ্যে সাত টার মধ্যে বাসায় ফিরতে হবে, ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে কুরআন তেলওয়াত, মর্নিং ওয়াক, ফিরে গোসল এবং স্কুলে যাবার প্রস্তুতি। একই কমপাউনডে ছিলো বাবার চেম্বার আর এক পাশে আমাদের বাসা। বাবার চেম্বার ছিল স্কুলে আসা যাওয়ার চেক পোস্ট। মাথা ঠিকমতো আচরানো হলো কিনা, জুতোর ফিতা, সার্ট ইন, সবকিছু ঠিক ঠাক মতোন Quality Control এ পাশ হলে, স্কুলে যাওয়া না হলে আবার Back to the Pavilion, মানে বাসায় ফেরত। স্কুল ছিলো বাসা থেকে ১-২ কিলোমিটারের রাস্তা। হেটে যাওয়া আসার কড়া নির্দেশ। ইংরেজীটা পড়াতেন বাবা নিজেই, রাতের বেলা চেম্বার শেষ করে নোট করে দিতেন যত্ন করে। একটা ইংরেজী শব্দ ভুল হলে ২০ বার করে লিখতে হতো, এ কষ্টের কথা চিন্তা করে সাবধানে লিখতাম । দশম শ্রেণীতে পড়াকালে ইয়া মোটা টেস্ট পেপার থেকে বেছে বেছে স্কুল গুলো থেকে পরীক্ষা নিতেন । এসব কিছুর মধ্যেও Six Million Dollar Man, The Fall Guy, Macgyver, Wonder Woman, এইসব দিন রাত্রি, অনন্ত নক্ষত্রের রাত, কোথাও কেউ নেই, ম্যাগজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদি কখনো Miss হতো না (বিদ্যুৎ গোলযোগ ছাড়া)।

রোজার দিনগুলোতে ছিলো অন্য রকম আমেজ। এ সময় নিয়ম কানুন একটু শিথিল করা হতো। অন্য মাদের মতোই প্রচন্ড গরমে কষ্টের কথা ভেবে চাইতেন না পুরো রোজাটা রাখি। নতুন নতুন ফতোয়া দিতেন এই যেমন মাটির কলসে ফুকে (রোজাটা গচ্ছিত রেখে) কিছু খেয়ে আবার কলস খুলে রোজাটা নিয়ে নেয়া ইত্যাদি। ইফতারে থাকতো মায়ের হাতের মজার মজার খাবার হালিম, ছোলা, বেগুনী, পেয়াজু, জিলাপী, পায়েশ ইত্যাদি। এরপর দুধের সর পড়া ঘন চা। সেহেরীতে চোখ ডলতে ডলতে উঠতাম। দুচোখ বন্ধ করে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কষ্ট করে খাওয়া। খাবারে যাই থাকুক না কেন তিন চামচ ডাল, সবজি বাধ্যতামূলেক ছিলো। পালা ক্রমে মাছ মাংস থাকতো। সবচেয়ে অপছন্দের তরকারী ছিলো তিত করলা। এটা যেদিন থাকতো সেদিন চেহারা বাংলার পাঁচের আকার ধারন করতো। মাঝে মধ্যে সময় সুযোগ মতো জানালা দিয়ে করলা বাহিরে পাচার হয়ে যেতো দৃষ্টির অগোচরে । এ কাজে 'Partner in Crime' ছিলো ছোট ভাই আর ঘসেটি বেগমের ভূমিকায় বোন । দুধ-আম-কলাও খেতে হতো অল্প করে হলেও।

ঈদ ছিলো অন্য রকম রোমাঞ্চকর। ঈদ সেলামীর Excitement-এ ঈদের আগের রাতে ঘুমই আসতো না। নতুন কচকচে নোটের প্রতীক্ষায় থাকতাম বাবা-চাচাদের কাছ থেকে। চাঁদরাতে মা জিজ্ঞেস করতেন কি খেতে চাই ঈদে। যার যার পছন্দের কথা বলে দিতাম। এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরে বাড়াতাম ঈদের জামা কাপড় গায়ে দিয়ে। বাসার খাবার টেবিলে থাকতো লাচ্ছি শেমাই, চটপটি, হালিম, জর্দা ও পায়েশ। ভৌগলিক দূরত্বের কারনে দীর্ঘ ২০ বছর ধরে ভাই-বোন-বাবা-মা (মাকে হারাই ২০১৭ তে) নিয়ে সবাই মিলে এক সংগে ইফতার করা হয়নি । রোজার দিনের হারিয়ে যাওয়া শৈশবের এ রঙিন স্মৃতিগুলো আজ খুব নাড়া দেয়। ঐসব স্মৃতি মনে হলে জগজিৎ সিং-এর গানের কলির মতো মনটা ডুকরে কেদে বলে ওঠে-
'ইয়ে দাওলাত ভি লে লো,
ইয়ে শাহারত ভি লে লো
ভালে চেন লো মুঝসে মেরি জাওয়ানি
মাগার মুঝকো লটা দো বাচপান কা শা'ভান
ও কাগজ কি কাষ্টি, ও বারিস কা পানি'।

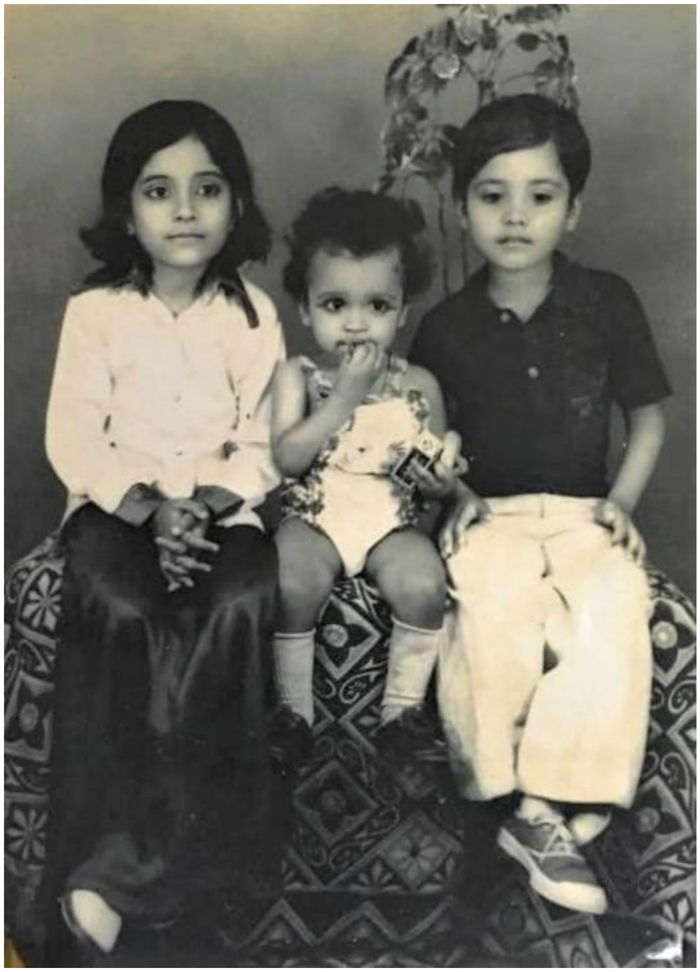

র. আমিন
ঈদ আনন্দের সেই দিনগুলি

আশির দশকের আগের কথা বলছি-তখন আমরা সাত ভাই, দুই বোন মিলে আম্মার সাথে যমুনার তীরে অবস্থিত নদী বিধৌত সিরাজগঞ্জ শহরে 'স্মরণিকা' ভবনে বসবাস করতাম, আব্বা গত হয়েছিলেন ১৯৭৩ সালে।

পাঁচ দিন আগে থেকেই আমাদের ঈদের আনন্দ শুরু হয়ে যেতো। বড়ভাই সিরাজগঞ্জ থেকে, মেজ ভাই চিটাগাং থেকে, দুলাল ভাই ঢাকা থেকে আমাদের জন্য ঈদের জামা,প্যান্ট, পাঞ্জাবি বা জুতা কিনে উপহার দিতেন। বেলাল ভাই ও বড় আপা মানে সুইট আপা রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে আসতেন আমাদের সাথে ঈদ করতে। এদিকে বড়ভাই,মেজভাই,দুলাল ভাইও এসে একসাথে হতেন। সে কি আনন্দ ভাইবোনদের মিলন মেলায়! ভাই-বোনদের কাছ থেকে পাওয়া ঈদের নতুন জামা,প্যান্ট,পাঞ্জাবি বা জুতা আমরা ছোটরা লুকিয়ে রাখতাম। বেলাল ভাই ও সুইট আপা 'ঈদ সংখ্যা' (বিচিত্রা বা রোববার)কিনে আনতেন, ঈদ সংখ্যার রঙিন পাতাগুলো আমি কেন যেন সংগ্রহ করে আনন্দ পেতাম । বড়ভাই, মেজভাই ও দুলাল ভাই- এই তিন ভাই আলাদা আলাদা গ্রুপ করে ঈদের বাজারের জন্য বের হতেন- আমি, মাসুদ ভাই ও মাসুম ভাই গ্রুপ হয়ে সঙ্গে যেতাম । বাজারে গিয়ে আবার আমাদের গ্রুপে গ্রুপে দেখা হয়ে যেত, সেটাও আরেক আনন্দ ছিল । সবাই একগাদা বাজার করে আনত- সেমাই, দুধ, চিনি, পোলাও-এর চাল, মুরগী, মাংস, ঘি, কিচমিচ, দারুচিনি ইত্যাদি । এনে রান্না ঘরে জমা করতো ।

ঈদের আগের দিন চলত ঈদ কার্ড বানিয়ে বন্ধুদের গিফট দেয়া । এজন্য আর্টিস্ট বন্ধুরা দিনভর রঙ পেন্সিল নিয়ে 'ঈদ মুবারক'-এর বিভিন্ন ডিজাইন তৈরিতে ব্যস্ত থাকতো । আঁকা শেষ হলে যে যার মতো কার্ড দিয়ে বন্ধুদের ঈদের শুভেচ্ছা জানাতো । ঈদের আনন্দ বহুগুণে বেড়ে যেতো ঈদের আগের দিন সন্ধ্যায় ঈদের চাঁদ দেখে । ইসলামিয়া কলেজ মাঠে পাড়ার ছেলেরা একসাথে চাঁদ দেখতে যেতো, ভিড় হতো আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। অবশেষে চাঁদ দেখা গেলে আনন্দে আত্মহারা সবাই। অন্যদিকে, পাড়ার মেয়েরা ঘরে ঘরে শুরু করতো মেহেদি উৎসব- মেহেদির পাতা বাটার প্রতিযোগিতা আর হাতে হাতে মেহেদির নক্সা- আমরা ছোট ছোট ভাইরাও রেহাই পেতাম না। আবার সুইট আপা সারারাত ধরে আমাদের ও প্রতিবেশীদের ঈদের কাপড় সেলাই ও আয়রন করতেন, ইতি আপাকে সাহায্য করতো। আর আম্মা রান্নাঘরে ঈদের রান্নায় ব্যস্ত। আর এদিকে আমি 'দস্যু বনহুর' সেজে মুখে মুখোশ পড়ে প্রতিবেশীদের ভয় দেখাতাম । রূপকথার গল্প, সিন্দাবাদ-এর পাশাপাশি রোমানা আফাজ-এর 'দস্যু বনহুর' সিরিজ পড়ার আমার এক অদম্য নেশা ছিল, দস্যু বনহুর হওয়ার স্বপ্নও দেখতাম।

চাঁদ দেখার পর পাড়ার ছেলেরা রাতভর পর্যন্ত টায়ারের মশাল জালিয়ে আনন্দ মিছিল করতো আর শ্লোগান দিতো,
-'ঈদ মুবারক', আজ আমাদের কিসের দিন? ঈদের দিন, ঈদের দিন' ।
কোন প্রতিবেশীর মুরগী চুরি করে পিকনিক করতো, সারারাত মাইকে বাংলা সিনেমার গান বাজাতো। আর এভাবে নিজেদের ঘুম হারাম করতো, প্রতিবেশীদেরও ঘুম হারাম করতো। পরদিন অর্থাৎ ঈদের দিন সারাদিন ঘুমিয়ে কাটাত, এ কেমন ঈদ উদযাপন ? পাড়ার অনেক বন্ধু ব্ল্যাকে অনেক দামে সিনেমার টিকেট কেটে ঈদের সারাটা দিন সিনেমা দেখে কাটাতো- মর্নিং, ম্যাটনি, ইভিনিং সো। এ কেমন ঈদ উদযাপন ?

ঈদের দিন সকালে উঠে লাক্স সাবান দিয়ে গোছল করতাম- টিউবওয়েলের কাছে গোসলের কিউ লেগে যেতো, তার সাথে সাথে হৈচৈ, গণ্ডগোলও শুরু হয়ে যেতো। গোসল শেষে সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা পড়ে, আতর লাগিয়ে, আম্মার হাতের তিন রকমের সেমাই (দুধ সেমাই, শুকনা সেমাই ও লাচ্ছি সেমাই) খেয়ে,

সাত ভাই মিলে একসাথে ঈদগাহ ময়দানে যেতাম- ঈদগাহে যাওয়ার সময় কেন যেন সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেতাম। ঈদের নামাজ শেষে কুলাকুলি, আহা! সেকি আনন্দ ! বাসায় এসে সবাই মিলে পোলাও-কোর্মা-বিরিয়ানিসহ আরও হরেক রকম খাবার খাওয়া। তারপর দ্বিতীয় পর্বের পোশাক পরিধান-পাঞ্জাবি, পায়জামা খুলে শার্ট,প্যান্ট, জুতা পড়ে ফিটবাবু সেজে সারাদিন পার করা। ফিটবাবু সেজে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিবেশী-বন্ধু-আত্মীয়দের বাসায় বাসায় বেড়ানো, বাসার আসে পাশের দোকানে দিনভর জোরে জোরে হিন্দি গান বাজানো, গানের তালে তালে পাড়ার ছেলেদের ড্যান্স করা আর কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া। পাড়ার অনেক বন্ধু সারাদিন এলাকায় রিক্সা অথবা বাইকে চড়ে বেড়াতো । অন্যদিকে, পাড়ার 'রাজকন্যা'রা অপরূপ রূপে সেজে দলবেঁধে বের হতো, রাজকন্যাদের সাজগোজ ও বেড়ানো দেখে পাগল পাড়ার ছেলেরা-এ এক অনাবিল ঈদ আনন্দ !

সন্ধ্যায় সবাই টিভির সামনে-ঈদের বিশেষ নাটক অথবা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান উপভোগ। প্রতিবেশীরা টিভির অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমাদের বাসায় ভিড় করতো। সে সময়ের টিভি প্রোগ্রামের কথা আজো ভুলতে পারিনি, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-ধারাবাহিক নাটক 'সকাল সন্ধ্যা',ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ফজলে লোহানির 'যদি কিছু মনে না করেন', ইংলিশ মুভি 'টারজান','দ্য সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান' ইত্যাদি। ঈদের পরদিন আমরা আত্মীয়-প্রতিবেশী-বন্ধু বান্ধবদের বাসায় বেড়াতে যেতাম, অনেকে দল বেধে সিনেমা দেখতে যেতো, অথবা দল বেধে স্টুডিওতে যেয়ে সাদা-কালো ছবি তুলতো। বিকেল বেলায় যমুনা নদীর তীরে বেড়াতাম, ব্রিটিশ শাসনামলে জর্জ ইলিয়ট-এর তৈরি 'পিলার বিহীন' ইলিয়ট ব্রিজে বেড়তাম অথবা গণিত সম্রাট 'যাদব চক্রবর্তী'র রাজপ্রাসাদে বেড়াতাম ।

পূর্বের কথায় ফিরে আসি-অপেক্ষায় থাকতাম, ঈদে নুতন কি ছবি মুক্তি পাবে ? আমাদের শহরে দুটো সিনেমা হল ছিল, এই দুই সিনেমা হলের মধ্যে কম্পিডিসন হতো- নায়িকা শাবানা বনাম নায়িকা ববিতা। উদাহরণ স্বরূপ শাবানা অভিনীত সিনেমা 'তুফান' বনাম ববিতা অভিনীত সিনেমা 'নিশান'। নিশান ছবিতে নায়িকা ববিতার শাহজাদী চরিত্রের চেহারা আজো ভুলতে পারিনি । তুফান ছবিতে নায়িকা শাবানা নেচে নেচে যে গেয়েছিলেন-'ও দরিয়ার পানি, তোর মতলব জানি ? ', পানির সেই মতলব আজো আমার জানা হলো না ।

সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা, সুন্দর কাটুক সবার ঈদ ।

'ঈদ মুবারক'।

আমার প্রাণপ্রিয় আব্বা-আম্মা

আমি ও আমার প্রিয় ছোটবোন ইতি

আমি যখন 'দস্যু বনহুর'

আমাদের 'স্মরণিকা' ভবন

শামসুন নাহের রুবী
শৈশবে রোজার দিনগুলো

শৈশবে রোজার দিন গুলো ছিল অনেক বেশী আনন্দময় এবং প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। বাবা-মা, ভাই, আত্মীয় -স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কাটানো পবিত্র রমজান মাসের কথা মনে হলে বারবার অতীতে ফিরে যেতে চায় মন। না চাইলেও অতীত এবং বর্তমানের সাথে একটা পার্থক্য চলে আসে অযাচিতভাবে। মন কিছুটা হয় বিষন্ন ও ভারাক্রান্ত।

আমার বাবার কর্মসূত্রে একটি রেস্ট্রিকটেড এরিয়াতে থাকার কারনে, পাড়া প্রতিবেশী সকলের সাথে ছিল আমাদের ভালবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ন সম্পর্ক। যতদূর মনে পড়ে অনেক ছোটবেলা থেকেই রোজা রাখা শুরু করেছি একটা দুইটা করে। এর একটি বড় কারন ছিল আমাদের পাড়া-প্রতিবেশী, ভাই-বোন বন্ধুদের সাথে চলতো রোজার প্রতিযোগীতা। এর ফলে কে বেশী রোজা রাখতে পারে, তার সুন্দর প্রতিযোগিতা চলতো আমাদের মধ্যে। পারিবারিকভাবে ছোটবেলায় ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে বড় হয়েছি আমরা, কিন্তু কোন গোঁড়ামী ছিল না। ছোটবেলায় রোগা পাতলা এবং একমাত্র মেয়ে ছিলাম বলে বাবা-মা রোজা রাখতে দিতে চাইতেন না। কিন্তু আমার জেদের কারনে মাঝে মাঝে রাখতে দিতেন।প্রায় সময়ই ডেকে তুলতেন না। এতে আমি রাগ করতাম এবং কান্নাকাটি জুড়ে দিতাম। আমার বাবা নরম প্রকৃতির এবং আমার প্রতি অতি মাত্রায় স্নেহ প্রবনতার কারনে, আমার কান্নাকাটি দেখে প্রবোধ দেওয়া জন্য ‘দরজা বন্ধ করে খেয়ে রোজা রাখা যায়’ এমনটি বলে সান্ত্বনা দিতেন। মাঝে মাঝে অতি সন্তর্পণে খেয়ে ভাতে পানি দিয়ে রাখতেন।যাতে আমি উঠে গেলেও খেতে না পারি। এর কারন ছিল খাবার পর রোজা ভাংতে চাইতাম না।

আমাদের কম্পাউন্ডে নিজস্ব স্কুল ও মসজিদ থাকায় সেহরির সময় মাইকে ঘোষণা করা হতো। এছাড়াও রাতে ডিউটিরত দারোয়ান চাচারা হুইসেল বাজিয়ে এবং হাতের ছোট্ট মাইকের মাধ্যমে সকলকে জাগিয়ে তুলতেন। তখনকার সময়ে সকলের বাসায় ফ্রিজ না থাকায় মধ্য রাত্রিতে ভাত রান্না করে তা গরম গরম পরিবেশন করতে দেখেছি আমার মাকে। সেহেরীর আকর্ষণ ছিল ঘন দুধ ও কলা দিয়ে ভাত। ইফতারীতে এখনকার মতো টেবিল ভর্তি খাবার পরিবেশন করা হতোনা। বেশীর ভাগ সময় নিজেদের গাছের এলাচি লেবু দিয়ে শরবত করা হতো আমাদের বাসায়। ছোট বেলায় ঘরে ফ্রীজ ছিল না বলে বাজার থেকে বরফ কুচি কিনে শরবত করা হতো। সেটা যে সবসময় তা নয় মাঝে মাঝে। রুহ-আফজা দিয়ে শরবত করা হতো তবে সেটা আমার কাছে একদম পছন্দের ছিলনা-ওষুধের মতো মনে হতো, এখনো তাই মনে হয়।ছোলা, পেঁয়াজু, বেগুনী এবং মৌসুমী দু-একটা ফল থাকতো ইফতারীতে। ছোলা, পেঁয়াজু, বেগুনী, মুড়ি একটি বড় বোলে পেঁয়াজ, মরিচ, সরিষার তেল ও ধনেপাতা মাখিয়ে সবাই মিলে তা উপভোগ করতাম। একই বোলে খাওয়ার মধ্যে আলাদা একটি তৃপ্তি ছিল, যা এখন ইফতারীতে খুঁজে পাইনা। ইফতারিতে আরেকটি আকর্ষণ ছিল আমাদের স্কুলের দপ্তরী সাত্তার ভাইয়ের তৈরী অসাধারণ স্বাদের পেঁয়াজ, বেগুনী। রোজার সময়টাতে বাড়তি ইনকামের জন্য তিনি এই কাজটি করতেন অতি যত্ন সহকারে। আব্বার কাছ থেকে টাকা নিয়ে মাঝে মাঝে উনার তৈরী পেঁয়াজু, বেগুনী কিনে আনতাম। ছোটবেলায় বাইরের খাবারের মজাই ছিল আলাদা।

রমজানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল দুপুরে মসজিদে কোরান শরীফ পড়তে যাওয়া। বছরের অন্যান্য দিনে ভোরবেলা পড়তে যেতে হতো। আমাদের সমবয়সী বন্ধু এবং অন্যান্য ভাই-বোনেরা দল বেঁধে মসজিদে যেতাম এবং সুর করে তেলাওয়াত করতাম। একটু বড় হয়ে কোরান পড়া নিয়েও প্রতিযোগিতা হতো, কে বেশি পড়তে পারে ? রমজানে পুরো মাস স্কুল ছুটি থাকার কারণে পড়াশোনার অতোটা চাপ ছিল না। ফলে নানাবিধ খেলাধূলায় মেতে উঠতাম আমরা। শীতলক্ষ্যা নদীর তীর ঘেঁষে আমাদের আবাসিক এলাকা ছিল বলে, বন্ধুরা এবং পাড়াপ্রতিবেশিরা মিলে নদীতে গোসল ও সাঁতার

কাটতাম। নদীর শান বাঁধানো ঘাটে বিভিন্ন ধরনের বোট, স্পিডবোট, বিভিন্ন ধরনের লঞ্চ, জাহাজ নোঙর করা থাকতো। সেই লঞ্চ থেকে ঝাপ দিয়ে পানিতে সাঁতার কেটে বেড়াতাম।দারুণ মজার ছিল সেই দিনগুলো। এছাড়া নদীর পাড়ে জেটিতে ঝিরিঝিরি ঠান্ডা হাওয়ায় বসে নানা ধরনের গল্প, কবিতা, গানে মেতে উঠতাম আর পরিকল্পনা করতাম এবার ঈদে কে কি জামা কাপড় নেবে।

রোজায় সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল ঈদের জামা তৈরী করা এবং ঘরে তৈরী ঈদ কার্ড বিনিময় করা নিয়ে। একালের মতো আমাদের সময়ে সারা বছর ভরে জামা কাপড় তৈরীর হিড়িক ছিলনা। আমাদের জামা কাপড় ছিল খুবই সীমিত। তাই রোজা এলে বাড়তি একটা আনন্দ নতুন জামা-জুতো পাবো বলে। আমি ছোটবেলায় জামা-কাপড়ের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলাম। নতুন ডিজাইন এবং অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা হবে এই চিন্তায় বাবার হাত ধরে বাজার থেকে নিজে কাপড় পছন্দ করে দর্জিকে বলে দিতাম- কিভাবে তৈরী করতে হবে। এবং সেই জামা লুকিয়ে রাখতাম কেউ যেন দেখে না ফেলে। নতুন জামা পাওয়ার প্রত্যাশায় রোজাকে ঘিরে কতো যে আনন্দ ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়।
রমজান সিয়াম সাধনার মাস, সংযম প্রদর্শনের মাস। আধুনিক যুগে এ মাসকে ঘিরে খাবার ও কাপড়চোপড় নিয়ে বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায় সেটা একটু দৃষ্টিকটু মনে হয় আমার কাছে। আমাদের সময়ে আমরা অল্পতেই তুষ্ট ছিলাম।অল্পতেই আমরা আনন্দ খুঁজে পেতাম সবকিছুতেই যা বিত্ত বৈভব ও প্রাচুর্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

পবিত্র রমজান আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দেয়।সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে গরীবের ক্ষুধার যন্ত্রণা।এই যন্ত্রণার সাথে কোন কিছুর তুলনা নেই। তাই তো এ মাস-বেশী বেশী দান সদকার মাস। আসুন এমাসে আমাদের এ কাজটি করি পরম করুনাময়ের নামে নিঃস্বার্থ ভাবে।

ঈদ-এর রান্নাবান্না ও অতিথি আপ্যায়ন
তাসনিম জেরিন

ঈদ এর আয়োজন মানেই বাহারি স্বাদের খাবার দাবারে ভরপুর সময়। ঈদের দিন সকাল থেকেই চলে খাওয়া-দাওয়া, গল্প-আড্ডা, প্রতিবেশি এবং আত্মীয়স্বজনের বাসায় যাওয়া এবং মজাদার সব খাবার খাওয়া। যদিও রোজার ঈদে আয়োজনটা থাকে এক ধরনের, তবে কোরবানির ঈদে এই আয়োজনের পুরোটা জুড়েই যেন থাকে গরু এবং খাসির মাংসের বাহারি আয়োজন। আর এই আয়োজনের পাশাপাশি অতিথি আপ্যায়নে চলে নানা ধরনের প্রস্তুতি।

ঈদের আমেজে ঘরে অনেক ধরনের রান্না হবে এটাই স্বাভাবিক। ঈদের নামাজ শেষে মিষ্টি জাতীয় খাবার যেমন- সেমাই, জর্দা, পুডিং, কুনাফা ইত্যাদি দিয়ে সকালের খাবার খাওয়া শেষে আর ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা ব্যস্ত হয়ে যাই । আর এসব কিছু শেষে রাতে বাসায় যেমন হয় অতিথির আগমন, তেমনি আমরাও যাই আমাদের আত্মীয়দের বাসায়। ঈদের ব্যস্ততা শেষে অনেকেই আর বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়ার সময় করে উঠতে পারেন না। তাই বন্ধুদের সাথে দেখা করার জন্য পরের দিনটি না হয় বরাদ্দ রাখুন। আর ঈদের দিনটি কাটুক অতিথি আপ্যায়নে এবং পরিবার এবং আত্মীয়দের সময় দিয়ে।

ঈদের দিন বাসায় অতিথি আসবে, তাই ডাইনিং টেবিলের সেটআপ নিয়ে আগে থেকেই ভেবে রাখুন। রুমের মাঝে থাকা টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে কিছু ফুল রাখতে পারেন। আর এর পাশে সুন্দর কোন ডেকোরেশন পিস। আগে থেকেই পরিপাটিভাবে টেবিলে প্রত্যেকটি ডিনারের সেট সাজিয়ে রাখুন। সাথে ন্যাপকিন থেকে শুরু করে, ডিনারওয়্যার, ফর্ক-নাইফ-স্পুন, আর গ্লাসগুলো গুছিয়ে আলাদা কোন ট্রলি বা ট্রে-তে রাখুন।এ্তে করে অতিথি আসলে কোনধরনের হুড়োহুড়ি লাগবে না।

এবার আসি খাবারের মেন্যুতে। ঈদের দিনের প্রধান খাবারের তালিকায় গরু বা খাসির মাংস থাকবে এটাই স্বাভাবিক। দুপুরের আয়োজনের জন্য না হলেও রাতের আয়োজনে রাখতে পারেন চালের রুটি। যদিও গরু বা খাসি দিয়ে একেকজন একেক ভাবে রান্না করতে পছন্দ করেন। তবে আমাদের আজকের আয়োজনে ঈদের রান্নাবান্নার অংশ হিসেবে বেশ পরিচিত এবং মজাদার দুইটি রেসিপি দেয়া হলো। ঈদের আয়োজনে অতিথি আপ্যায়নে অন্য কিছু রান্নার পাশাপাশি গরু এবং খাসির মাংসের এই দুইটি আইটেম আপনিও চাইলে বানাতে পারেন। আর এই দুইটি আইটেমের একটি হলো কাটা মসলা দিয়ে গরুর মাংস রান্না এবং খাসির শাহী রেজালা বানানোর প্রক্রিয়ার বিস্তারিত।

কাটা মসলায় গরুর মাংস

উপকরণ- গরুর মাংস ২ কেজি, পেঁয়াজকুচি ৩ কাপ, বেরেস্তা ২ কাপ, আদা ২ টেবিল চামচ, রসুনকুচি ২ টেবিল চামচ, শুকনা মরিচ, গোলমরিচ, কাঁচা মরিচ, লেবুর রস, দারুচিনি এলাচি, লবঙ্গ, তেজপাতা, আলু বোখারা, টমেটো কুচি, ভাজা শুকনা মরিচের গুঁড়া, হলুদগুঁড়া, লবণ, ঘি এবং সরষের তেল।

প্রণালি- মাংস ধুয়ে পানি ঝরিয়ে প্রথমে বেরেস্তা, লেবুর রস, ভাজা মরিচের গুঁড়া, ও কাঁচা মরিচ বাদে বাকি সব উপকরণ দিয়ে মাংস ভালোভাবে মেখে ৩০ মিনিটের জন্য রেখে দিন। এবার মাংস রান্নার হাঁড়িতে ঝরানো মাংস ঢেলে পরিমাণ মতো গরম পানি দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করতে হবে। মাংস কষিয়ে গরম পানি দিয়ে ঢেকে সেদ্ধ করে তাতে পেঁয়াজ বেরেস্তা, লেবুর রস, কাঁচা মরিচ ও ভাজা মরিচের গুঁড়া দিয়ে ঢেকে রেখে কিছুক্ষণ পর চুলা বন্ধ করে দিতে হবে। ঈদের দিন কাটা মসলায় গরুর মাংসের এই রেসিপির সাথে পোলাও বা চালের রুটি কিন্তু জমবে বেশ।

খাসির শাহী রেজালা

উপকরণ- খাসির মাংস ২ কেজি, টক দই, ঘি, লবণ পরিমাণ মতো, বেরেস্তা ১ কাপ, পোস্ত বাটা ২ টেবিল চামচ, মিষ্টি দই ১ কাপ, আদা ও রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, ধনে গুড়া, মরিচ গুড়া, হলুদ গুড়া-১ টেবিল চামচ, এলাচ, লবঙ্গ, জয়ত্রী গুড়া অর্ধেক চা-চামচ, গোলমরিচ, দারচিনি, জয়ফল আধা চা-চামচ, কাজু বাদাম ও পেস্তা বাদাম ৪ টেবিল চামচ, দুধ ১ কাপ, কিসমিস ১০/১২টি, আলু বোখারা ৬টি।

প্রস্তুত প্রণালী- মিষ্টি দই এর সাথে কাজু বাদাম ও পেস্তা বাদাম দিয়ে ব্লেন্ডারে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে পেস্ট করে নিয়ে একটি পাত্রে মাংস নিয়ে তার মধ্যে সব উপকরণ একসাথে দিয়ে খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে ম্যারিনেট করতে হবে। এবার ঢাকনা দিয়ে ৩০ মিনিট ঢেকে রাখতে হবে। চুলায় হাঁড়িতে পরিমাণ মতো ঘি দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখা মাংস ঢেলে দিতে হবে। মাঝারি আঁচে রান্না করতে হবে এবং অনবরত নাড়তে হবে। ২০ মিনিট রান্না করতে হবে। অতঃপর ১ কাপ দুধ দিতে হবে। আলাদাভাবে কোন পানি না দিয়ে ধীরে ধীরে মাংস সেদ্ধ হয়ে ঝোল বেশ ঘন হয়ে আসবে। এরপর আলুবোখারা দিয়ে দিতে হবে। এই পর্যায়ে দই এবং বাদামের পেস্ট দিয়ে দিতে হবে। এরপর কিসমিস দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়ে চুলা বন্ধ করে কিছুসময় রেখে দিতে হবে। ব্যাস, মজাদার খাসির শাহী রেজালা প্রস্তুত।

বিরিয়ানি, তেহারি এবং কাবাব্রের পাশাপাশি এই দুইটি আইটেমের যেকোনটি আপনিও চাইলে ঈদ উৎসবে রান্না করতে পারেন। ঈদের উৎসব মানেই পরিবার, আত্মীয় এবং বন্ধুদের সাথে কিছু ভালো মুহূর্ত কাটানো। উৎসবের এই দিনটিকে আরও বিশেষ করে তুলতে ঈদের রান্নাবান্না এবং গল্পে-আড্ডায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটুক হাসি-আনন্দে।

ঈদের সাজ হোক পরিপাটি ও স্নিগ্ধ

তিথি ইসলাম

দুয়ারে কড়া নাড়ছে ঈদ। ঈদের পোশাক আর অনুষঙ্গের কেনাকাটাতো শেষ। ঈদের দিন কিভাবে সাজবেন চলছে নিশ্চয় সেই প্রস্তুতি। গরমের এই সময়ে যতটা সম্ভব পরিপাটি ও স্নিগ্ধ সাজগোজেই ভালো লাগবে। ঈদের দিন নিজেকে পরিপাটি দেখানোর জন্য চুলের কাট, মেনিকিওর-পেডিকিওর, ফেসিয়াল এসব আজই সেরে নিতে পারেন। ঈদের দিন যেহেতু বিউটি সেলুনগুলো বন্ধ থাকে তাই ঘরে বসেই একা একা সাজতে হয়। পরিকল্পনা আর প্রস্তুতি থাকলে ঘরেই বসেই সুন্দর করে সাজগোজ করা সম্ভব। অতিরিক্ত গরমের পাশাপাশি বৃষ্টিমুখর ঈদ হওয়ায় সাজগোজ যতটা সম্ভব পরিপাটি আর হালকা থাকলেই ভালো। সারাবাংলার পাঠকদের জন্য ঈদের কোন বেলার সাজ কেমন হবে, এ নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন গীতিস বিউটি পার্লারের সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ সাবাবা বিল্লাহ ও মিউনিস ব্রাইডাল বিউটি সেলুনের স্বত্তাধিকারী তানজিমা শারমিন মিউনি।

<u>দিনের বেলার সাজ</u>

ঈদের দিনের সাজ সম্পর্কে সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ সাবাবা বিল্লাহ বলেন, এই গরমে সারামাস রোজা থেকে ত্বকের আর্দ্র ভাব কমে যেতে পারে। এজন্য ঈদের দিন সকাল থেকেই পানি ও অন্যান্য তরল খাবার বেশি করে খেতে হবে। যেহেতু গরম, ঈদের দিন সকাল ও দুপুরের পোশাক হালকা রঙের হলেই ভালো। সাথে হালকা মেকআপ। এই সময় লিকুইড ফাউন্ডেশন ভালো হবে। তার উপর হালকা করে পাউডার আর হালকা শেডের ব্লাশ-অনেই সাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। সাজে পরিপাটি ভাব বজায় রাখতে হালকা করে আইব্রো একে নেওয়া যেতে পারে। চোখের পাতায় চিকন করে আইলাইনার ও কাজল লাগালে ভালো লাগবে। আইল্যাশ ব্যবহার করলে চোখের সাজ ফুটবে বলে জানান তিনি। সাবাবা বলেন, চুল স্ট্রেইট হলে সামনে একটু বেণী করে আটকে দেওয়া যেতে পারে। আবার চুল খোলা রাখলেও ভালো দেখাবে। তবে বড় চুল খোঁপা করে ফুল গুঁজে দিলে গরমের ঈদে স্নিগ্ধতা এনে দেবে। আবার কার্ল করে ছেড়ে রাখলেও সুন্দর লাগবে।

<u>রাতের বেলার সাজ</u>

তবে রাতের পোশাক ভারি হতে পারে বলে মনে করেন সাবাবা বিল্লাহ। তিনি বলেন, ঈদের দিন রাতে সাধারণত দাওয়াতে যেতে হয়। এজন্য একটু ভারি সাজে ভালো লাগে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, শাড়ি জমকালো হলে হালকা মেকআপ দিতে হবে। আর মেকআপ ভারি হলে হালকা কাজের শাড়ি মানানসই। শাড়ির সাথে মিলিয়ে গহনা নির্বাচন করতে হবে। চুল আয়রন করে খোলা রাখা যেতে পারে। ছেলেদের সাজের ক্ষেত্রে সাবাবা বলেন, ঈদই বছরের সেই সময় যখন ছেলেরা একটু নিজেদের যত্ন নেয়। ছেলেদের ঈদের সাজগোজের প্রস্তুতিতে চুল বা দাড়ি কাটা বা ট্রিম করা ও মেনিকিওর-পেডিকিওর করা খুব জরুরি। ঈদের দিন ছেলেরা হালকা রঙের পাঞ্জাবী পরলে ভালো হবে। তবে পাঞ্জাবী পরুন কি ঈদের বিকেলে টি-শার্ট, পারফিউম দিতে ভুললে চলবে না একদমই। জেল দিয়ে চুলটা সেট করে নিলে গরমের ঈদে বেশ পরিপাটি দেখাবে বলে জানান তিনি।

তানজিমা শারমিন মিউনি বলেন, অন্যান্য অনুষ্ঠানের সাথে জমকালো সাজ মানালেও ঈদ তেমনটা নয়। ঈদে হালকা সাজেই ভালো লাগে। ন্যাচারাল লুকেই ভালো লাগে। ভারি মেকআপ ঈদে ভালো লাগে না। মিউনি বলেন, ঈদের খুশি মানুষের ভেতর থেকেই আসে। তাই চেহারায় এর প্রভাব পড়ে। আনন্দে থাকলে এমনিতেই সুন্দর দেখায়। এর সাথে ভারি সাজগোজ বা মেকআপের প্রয়োজন হয় না। তারপরও ঈদে হালকা সাজ দিলে তা মানানসই লাগে। এখন গরম যেহেতু বেশি, তাই ভারি মেকআপ স্বস্তিদায়ক হবে না বলে জানান মিউনি। এই সময় মেকআপ ব্যবহার না করে সানব্লকের সাথে ফাউন্ডেশন মেশানো লোশন বা ক্রিম (বাজারে পাওয়া যায়) ব্যবহার করা যেতে পারে। সাবাবার মত মিউনিও বলেন, সকালে হালকা রঙের পোশাকই মানাবে ভালো, সাথে হালকা সাজ। শাড়ি পরলে কপালে ছোট টিপ, হালকা চোখের সাজ আর হালকা রঙের লিপস্টিকে ভালো লাগবে।

খোলা চুলের ফ্যাশন বিশ্বের সব জায়গায় জনপ্রিয়। একটু আয়রণ করে চুল খোলা রাখলে দেখতে ভালো লাগে। তবে এই গরমে বড় চুল খোলা রাখলে অস্বস্তি লাগবে। সেক্ষেত্রে হাত খোঁপা বা বেণী করা যেতে পারে। খোঁপায় ফুল দিলে ভালো লাগবে বলে জানান মিউনি। আবার নানারকম বেণীতেও করা যায় চুলের নানা স্টাইল। সাধারণত ঈদের রাতে জমকালো সাজই পছন্দ করেন অনেকে। তাই রাতের দাওয়াতে ইচ্ছেমতো সাজাই যায়। সাজ-পোশাক মানুষের ব্যক্তিত্ব ও রুচির পরিচয় দেয়। ঈদের সাজ-পোশাক পছন্দ করার ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটি মনে রাখা দরকার। ছিমছাম আর পরিপাটি সাজে ঈদ হয়ে উঠুক প্রাণবন্ত।

ঈদে বেড়ানো
কবি ডেস্ক

ঈদের লম্বা ছুটিতে সবারই কোথাও না কোথাও ঘুরতে যাবার পরিকল্পনা থাকে। কারো ভালো লাগে পাহাড় আবার কারো সমুদ্র। তবে ঘুরে বেড়াতে আমরা সবাই কমবেশি পছন্দ করি। আর ঈদের লম্বা ছুটিতে সেই ঘুরে বেড়ানোর সুযোগটা কেউই হাতছাড়া করতে চায় না। সময় সুযোগ আর অবস্থা হিসেবে যে কেউ বেছে নিতে পারে তার পছন্দের বেড়ানোর জায়গা। তা হতে পারে দেশের ভিতরে বা দেশের বাইরে। আমাদের আজকের আয়োজন জানাবো ঈদে কোথায় বেড়াতে পারেন সেইসব জায়গা সম্পর্কে।

ঢাকার ভিতরে বিনোদনের কিছু স্থান

আজকাল থিম ভিত্তিক পার্কে সবাই ঘুরতে পছন্দ করে। আর ঢাকার ভিতরেই শিশু ও বড়দের বিনোদনের জন্য বেশ কিছু পার্ক রয়েছে। ছোট শিশুদের নিয়ে যেতে পারেন শাহবাগের শিশুপার্ক, শ্যামলীর শিশুমেলা, স্বামীবাগের ওয়ান্ডারল্যান্ড, জাতীয় চিড়িয়াখানা বা বসুন্ধরা সিটির টগি ওয়াল্ডে। আর বড়দের জন্য রয়েছে এমিউজমেন্ট পার্ক যেমন যমুনা ফিউচার পার্ক, আশুলিয়ায় নন্দন পার্ক ও ফ্যান্টাসি কিংডম। এছাড়াও যেতে পারেন নভো থিয়েটার, সিনেপ্লেক্সে বা সংসদ ভবনে। যারা প্রকৃতির কাছে যেতে পছন্দ করেন তারা যেতে পারেন বলধা গার্ডেন, বোটানিক্যাল গার্ডেন ও চন্দ্রিমা উদ্দ্যান।

শহর ও তার আশেপাশে

যান্ত্রিকতার বেড়াজাল পেরিয়ে এই ঈদে শহরের ভিতর বা একটু দূরে ঘুরে আসতে পারেন বেশ কিছু জায়গা থেকে। যেমন-

- হাতিরঝিল – রাজধানির হাতিরঝিলে ঘুরে আসতে পারেন সবাইকে নিয়ে। নতুন চালু হওয়া ওয়াটার বোটে যে কারো ঘুরতে ভালো লাগবে।
- সাগুফতা, মিরপুর – মিরপুর ডিওএইচএস এর দিকে নতুন রাস্তার পাশের একটু ফাকা জায়গা, গাছ গাছালি দিয়ে ঘেরা নিরিবিলি বসার জায়গা। রয়েছে ছোট একটা ঝিল। এটাই সাগুফতা নামে পরিচিত। ফাকা জায়গায় বসেছে নগরদোলা, বেলুন ও খেলনার নানা দোকান। দু কদম পেরুলে ঘোড়ার পিঠেও উঠে বেড়ানোর সুযোগ আছে।
- নুহাশ পল্লী, গাজীপুর – সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঢাকার গাজীপুরে নুহাশ পল্লী গড়ে উঠেছে, এর পুরোটা জুড়ে সবুজের সমাহার। রয়েছে সুইমিং পুল, ছোট্ট পুকুর আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল মাঠের মাঝখানে গাছের উপর ঘর যা অবাক করবে নিঃসন্দেহে।
- গাজীপুর সাফারি পার্ক – এই পার্কের অন্যতম আকর্ষণ হল ‘কোর সাফারি’ । এখানে দেখা মিলবে উন্মুক্ত বাঘ, সিংহ, জিরাফ, জেব্রা, চিত্রা ও মায়া হরিন, ভাল্লুকসহ অন্যান্য অনেক প্রাণী ।

<u>ঐতিহাসিক স্থান</u>

ছুটির দিনে পুরনো ইতিহাসের খোঁজে পরিবার নিয়ে যেতে পারেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক সব জায়গাতে। ভ্রমণ যেমন হবে তেমনি ইতিহাসের ছোঁয়াও পাওয়া যাবে এই জায়গা গুলোতে।

- সোনারগাঁও এবং বাংলার তাজমহল, নারায়ণগঞ্জ – নারায়ঙ্গঞ্জের কাছে অবস্থিত বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁও । এখানে দেখতে পাবেন লোকশিল্প জাদুঘর, কারু শিল্প মেলা ও পানাম নগরি। সোনারগাঁও থেকে একটু দূরে রয়েছে বাংলার তাজমহল। তাই সময় থাকলে এটাও ঘুরে আসতে পারেন।
- আহসান মঞ্জিল, ঢাকা – ঢাকার ইসলামপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। আহসান মঞ্জিলের স্থাপত্যশৈলী পর্যটকদের নিঃসন্দেহে আকর্ষণ করবে।
- বালিয়াটি জমিদার বাড়ি, মানিকগঞ্জ – বাংলাদেশের পুরাতন জমিদার বাড়িগুলোর মধ্যে অন্যতম বালিয়াটি জমিদার বাড়ি। ঢাকা জেলা থেকে ৩৫ কিলো দূরে সাটুরিয়া উপজেলায় অবস্থিত। মনোরম পরিবেশে ঘেরা জমিদার বাড়িতে ৭টি স্থাপনা রয়েছে।

- শালবন বৌদ্ধ বিহার, কুমিল্লা – বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার এক অনন্য নিদর্শন হল শালবন বৌদ্ধ বিহার। কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতিতে অবস্থিত।
- লাল বাগ কেল্লা, ঢাকা – পুরান ঢাকার লালবাগে অবস্থিত ঢাকার কেন্দ্রস্থলে বাংলার প্রাচীন দুর্গ। ইতিহাস প্রেমীদের জন্য অন্যতম জনপ্রিয় ভ্রমণ স্থান লালবাগ কেল্লা।
- মহেরা জমিদার বাড়ি , টাঙ্গাইল – জমিদার বাড়ীর ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার সাথে সাথে এখানে আছে পিকনিক স্পট ও মিনি চিড়িয়াখানা।

<u>রিসোর্ট</u>

যারা এক দুই দিনের জন্য শরীর ও মনের ক্লান্তি দূর করতে যেতে পারেন মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠা রিসোর্টগুলোতে। কোন রিসোর্টে আছে গ্রামীণ আবহ আবার কোনটাতে আধুনিকার ছাপ। রিসোর্ট গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – ভাওয়াল রিসোর্ট, সারাহ রিসোর্ট, ছুটি, নক্ষত্র বাড়ি, পদ্মা রিসোর্ট, প্যালেস লাক্সারি রিসোর্ট, দুসাই রিসোর্ট, গ্রান্ড সুলতান রিসোর্ট, জল জঙ্গলের কাব্য এর মতো আরও কিছু রিসোর্ট।

শহর ছাড়িয়ে অন্য শহরে

যারা একটু ঢাকার বাইরে যেতে চান বৈচিত্র্যের জন্য তারা বেছে নিতে পারেন চট্টগ্রাম, সিলেট আর খুলনার মতো বিভাগীয় শহরগুলো।

- চট্টগ্রাম – প্রথমেই বলি বন্দরনগরী চট্টগামের কথা। চট্টগ্রামে রয়েছে ফয়েজ লেক, সীতাকুণ্ড ইকো পার্ক, কালুর ঘাট মিনি বাংলাদেশ, পতেঙ্গা সৈকত, ওয়ার সিমেট্রি, ভাটিয়ারী ও মিরসরাই মহামায়া লেক।
- বান্দরবান – যাদের মেঘ ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে তারা ঘুরে আসতে পারেন পাহাড়ি কন্যা বান্দরবান জেলা থেকে। নীলগিরি, স্বর্ণমন্দির, মেঘলা, শৈল প্রপাতের মতো আরও অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে এখানে।বান্দরবান শহরে থাকার মতো রয়েছে অনেক হোটেল।
- খাগড়াছড়ি – অপরূপ সুন্দর জেলা খাগড়াছড়ি। খাগড়াছড়ির আকর্ষণীয় স্থান গুলোর মধ্যে – আলুটিলা গুহা ও ঝর্না, রিছাং ঝর্না, পানছড়ি অরণ্য কুঠির, মানিকছড়ি মং রাজবাড়ি, রামগর লেক ও চা বাগান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

- রাঙ্গামাটি – বাংলাদেশের পর্যটনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি জেলা হল রাঙ্গামাটি। রাঙ্গামাটি জেলার জনপ্রিয় ভ্রমণ স্থানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; কাপ্তাই হ্রদ, ঝর্না, সাজেক ভ্যালী, কাপ্তাই বাধ, পেদা টিং টিং রেস্তোরা, ঝুলন্ত সেতু, বৌদ্ধবিহার সহ আর অনেক কিছু আছে দেখার।
- কক্সবাজার – সাগরের কাছে যেতে চাইলে নিঃসন্দেহে যেতে পারেন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে। এছাড়াও যেতে পারেন হিমছড়ি, ইনানী, রামু, মহেশখালী ও কুতুবদিয়া এর মতো জায়গায়।

- সিলেট – দুটি পাতা একটি কুড়ির দেশ বলা হয় সিলেটকে। এই জেলায় রয়েছে শাহ জালাল, শাহ পরানের মাজার। আরো আছে রূপকন্যা হিসাবে পরিচিত জাফলং। তাছাড়াও ঘুরে আসতে পারেন রাতারগুল, লালাখাল, বিছানাকান্দি ও খাদিমনগর চা বাগান।
- শ্রীমঙ্গল – মৌলভীবাজার জেলার একটি উপজেলা শ্রীমঙ্গল। বাংলাদেশের ভ্রমণ পিপাসু মানুষের পছন্দের জায়গা এটি। এখানে রয়েছে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, বাইক্কা বিল, চা গবেষণা কেন্দ্র। এছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু ভালো মানের রিসোর্ট। দেশের স্বনামধন্য হোটেল গ্র্যান্ড সুলতান এর অবস্থান ও এই শ্রীমঙ্গলেই।

ঈদের কবিতা

লক ডাউনে আছি বন্ধু 'ঈদ মুবারক'
র.আমিন

লক ডাউনে আছি বন্ধু 'ঈদ মুবারক'
তবু ভুলতে পারিনা তোমাকে কবি নজরুল-
"ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ......"।

ঈদ হবে আজ হোম কোয়ারেনটাইনে,
তবু দুঃখ নেই-
হাতে আছে তো মায়ের রান্না সেমাই।
ঘরে বসে দেখব আজ ঈদের চাঁদ,
তবু দুঃখ নেই-
হাতে আছে তো বোনের রঙিন মেহেদী।
আছে তো হাতে ফেসবুক আর ম্যাসেঞ্জার,
লক ডাউনে আছি বন্ধু 'ঈদ মুবারক'
তবু ভুলতে পারিনা তোমাকে কবি নজরুল-
"ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ......"।

ঘরে বসে পড়বো আজ ঈদের জামাত,
তবু আফসোস নেই-
কাছে আছে তো ভায়ের মডার্ন টি-শার্ট।
কুলাকুলি হবে আজ সামাজিক দূরত্বে,
তবু আফসোস নেই-
কাছে আছে তো বাবার দামী সেলামী।
আছে তো হাতে ফেসবুক আর ম্যাসেঞ্জার,
লক ডাউনে আছি বন্ধু 'ঈদ মুবারক'
তবু ভুলতে পারিনা তোমাকে কবি নজরুল-
"ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ......"।

ঈদের গান

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ
-উইকিপিডিয়া

'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' - মুসলমানদের অন্যতম ধর্মীয় ও আনন্দের উৎসব ঈদ-উল-ফিতর নিয়ে বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি কালজয়ী গান। গানটি বাঙালি মুসলমানের ঈদ উৎসবের আবশ্যকীয় অংশ।কবির শিষ্য শিল্পী আব্বাস উদ্দিন আহমদ-এর অনুরোধে ১৯৩১ সালে কবি নজরুল এই গান রচনা ও সুরারোপ করেন।

প্রথম রেকর্ডিং

১৯৩১ সালে গানটি লেখার চারদিন পর শিল্পী আব্বাস উদ্দিনের গলায় প্রথম রেকর্ড করা হয়।রেকর্ড করার দুই মাস পরে ঈদের ঠিক আগে আগে এই রেকর্ড প্রকাশ করা হয়।গ্রামোফোন কোম্পানি এর রেকর্ড প্রকাশ করে। রেকর্ডের অপর গান ছিল কবির 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর, বদনসীন আয়, আয় গুনাহগার নতুন করে সওদা কর।' হিজ মাস্টার্স কোম্পানির রেক রেকর্ড নম্বর এন- ৪১১১। গানটির প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ।

গানের কথা

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ,
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন আসমানী তাগিদ।
তোর সোনা-দানা, বালাখানা সব রাহে লিল্লাহ
দে যাকাত, মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙাইতে নিঁদ,
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।

আজ পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সেই সে ঈদগাহে,
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ।
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।

আজ ভুলে যা তোর দোস্ত-দুশমন, হাত মেলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরিদ।
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।

যারা জীবন ভরে রাখছে রোজা, নিত্য উপবাসী,
সেই গরীব ইয়াতীম মিসকিনে দে যা কিছু মুফিদ,
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।
আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ।

ঢাল হৃদয়ের তশতরীতে শিরনি তৌহিদের,
তোর দাওয়াত কবুল করবেন হজরত হয় মনে উম্মীদ।
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।

তোরে মারল' ছুঁড়ে জীবন জুড়ে ইট পাথর যারা,
সেই পাথর দিয়ে তোলরে গড়ে প্রেমেরই মসজিদ।
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ,
আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ।